# অনিন্দ্যা ।

# অনিন্দ্যা।

[ গল্প ]

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, এম্, এ।

প্রকাশক,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্যারাগণ প্রেস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

মূল্য ছয় আনা।

'তুমি এস এস নারি,
আন তব হেম ঝারি,
ধুয়ে মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন ছিন্ন,
সুন্দর কর, সার্থক কর,
পুঞ্জিত আয়োজন।'

রবীন্দ্রনাথ

# ভূমিকা।

ইংরাজ কবি টেনিসনের Geraint and Enid অবলম্বনে গল্পটি লিখিত হইল। এখনকার দিনে এইরূপ 'সেকেলে' ধরণের গল্প সাধারণের ভাল লাগিবে কি না জানি না। কিন্তু আমাদের অনিন্দ্য-চরিতা কুললক্ষ্মীগণ 'অনিন্দ্যা'কে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নয় মনে করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

৬০ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট<br>
কলিকাতা<br>
১৫ই আশ্বিন, ১৩২০।

গ্রন্থকার

আমার পত্নীর করকমলে

'অনিন্দ্যা'কে

অর্পণ করিলাম।

# অনিন্দ্যা

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### অপমান

ভোর না হইতেই রাজা ধর্ম্মপাল মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার অসংখ্য অনুচর। অশ্ব-খুর-শব্দে নগর-বাসীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যখন সকলে নগরোপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বাকাশ ঊষার লোহিতরাগে রঞ্জিত হইল। বন তথা হইতেও অনেক দূরে। মহোল্লাসে শিকারিগণ রাজার অনুগমন করিতে লাগিল।

সামন্তরাজ বীরসেনের পুত্র গিরণ মহারাজ ধর্ম্মপালের প্রাসাদে কিছুদিন হইতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার নবীন যৌবন, অনিন্দ্য সুন্দর কান্তি। কিন্তু বাহ্যসৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের গুণ-রাশিই তাঁহাকে সমধিক অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়া-

ছিল। দয়াদাক্ষিণ্য বিনয়াদি গুণে তিনি যেমন একদিকে সকলের প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহার রণ-কুশলতা অপরদিকে তেমনই আবার শত্রুগণের ভীতির কারণ ছিল। হৃদয়ে তাঁহার অসীম সাহস, বাহুতে তাঁহার অমিত বল। বস্তুতঃ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহার ন্যায় যোদ্ধা তখন খুব কমই ছিল। পুত্র যাহাতে অন্যান্য রাজকুমার ও বীরগণের সাহায্যে সম্যক্ আত্মোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়, সেই জন্যই রাজা বীরসেন তাঁহাকে রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের সভায় কিছুদিন অবস্থানের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কুমার গিরণ এখন ও অবিবাহিত।

গিরণের পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল যে মহারাজের সহিত মৃগয়ায় যোগদান করিবেন। কিন্তু আজ যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন সূর্য্যদেব চক্রবাল ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানিলেন যে তিন চারি দণ্ড পূর্ব্বে মহারাজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা, এই মনে করিয়া রাজকুমার অশ্বা-

রোহন করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইলেন। শিকারে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া মনে বিলক্ষণ কষ্ট হইল। এখন আর সঙ্গে কোন অস্ত্র লওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না।

ফাল্গুন প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ু যখন তাঁহার চূর্ণ কুন্তল ও আংরাখা লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে শরীর মধুর স্পর্শে বীজন করিতে লাগিল, তখন তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বিষাদভার দূর হইয়া গেল। অশ্বও যেন প্রভুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সহর্ষ পাদবিক্ষেপে ছুটিতে লাগিল।

রাজা মৃগয়ার জন্য যে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে তাহারই আর এক প্রান্তে গিরণের অশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তাঁহার ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। তরল কিরণ স্নাত মুক্ত প্রকৃতির বাসন্তী শোভা দেখিয়া এবং পুলকাকুল সহস্র বিহঙ্গের কলকাকলি শ্রবণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মনের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় প্রফুল্লতার উদ্রেক হইয়াছিল। আরও কিছু-

ক্ষণ ভ্রমণ করিবার উদ্দেশে তিনি বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেলা এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেই গভীর অরণ্যের ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি ভেদ করিয়া সূর্য্যকিরণ রাজকুমারের অঙ্গে পতিত হইতেছিল। গিরণ প্রত্যাবর্ত্তন মানসে অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে কিয়দ্দূরে এক জন অশ্বারোহী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজানুচর হইবে, এই মনে করিয়া তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সম্মুখে আসিয়া গিরণ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। অশ্বারোহী একজন সুন্দর যুবা পুরুষ; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্নে মুখ মণ্ডল শ্রীহীন। পরিহিত পরিচ্ছদ মৃগয়া কালোচিত না হইলেও তাহার মধ্যে কেমন একটা অসামঞ্জস্য ও বিশৃঙ্খলতার ভাব বর্ত্তমান।

আগন্তুক গিরণের দিকে এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই বনমধ্যে এই অদ্ভুত রকমের লোকটিকে দেখিয়া গিরণ তাহার সহিত কথা না কহিয়া থাকিতে পারি-

লেন না। তাই তিনি অগ্রসর হইয়া বিনীত ভাবে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কোনই উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। গিরণের দুর্ভাগ্য যে তিনি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

মেঘ এইবার বজ্র নিক্ষেপ করিল। ভ্রুকুটি ভীষণ মুখ হইতে বজ্রকঠোর স্বর বাহির হইল। "আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি? ধৃষ্টতার সাজা গ্রহণ কর।" রূঢ় কণ্ঠে সে এই কয়টি কথা বলিয়া হস্তস্থিত কশাদ্বারা কুমারের গাত্রে সজোরে আঘাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বাসন্তী বিজয়

ক্ষণকাল বিস্ময়বিমূঢ় থাকিয়া গিরণ যখন দেখিলেন যে সেই কাপুরুষ দুর্ব্বৃত্ত পলায়ন করিতেছে, তখন ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি তীর-বেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। প্রতিপদে বৃক্ষকাণ্ডে তাঁহার অশ্বের গতি প্রতিরুদ্ধ হইতেছিল। শাখার ঘসণে তাঁহার ললাট কাটিয়া রক্তধারা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই তাঁহার মনে পড়িল যে তিনি নিরস্ত্র; অপমানের প্রতিশোধ লওয়া এখন তাঁহার সাধ্যাতীত। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন অশ্বারোহী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। গিরণ কিন্তু তাহাকে সমুচিত শিক্ষা না দিয়া ফিরিবেন না. ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এখানে কোথায় এবং কি রূপে অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে?

চিন্তিত ভাবে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পশ্চাদ্দিকে অশ্বপদের শব্দ শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন অশ্বারোহী তাঁহার দিকে আসিতেছে। এ আবার তাহারই ন্যায় কোন দুরাত্মা নাকি? অগ্নিবর্ষী নয়নে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে কাছে আসিতেই তাঁহার চক্ষু শান্ত ভাব ধারণ করিল, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। অশ্বারোহী তাঁহার বন্ধু কৃতীশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহে। ইনি মহারাজার সহিত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছিলেন; কিন্তু বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় তিনি একাকীই শিকারের অন্বেষণ করিতেছিলেন।

রাজকুমার গিরণকে সেখানে তদবস্থায় দেখিয়া কৃতীশ্বর বিস্মিত হইলেন। পরে যখন তাঁহার মুখে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি পাপিষ্ঠের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গিরণের সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গিরণ তাঁহার এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ

করিয়া বলিলেন, "ভাই, আমি একা নিজহস্তে এই অপমানের প্রতিশোধ লইব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আমি কেবল তোমার নিকট হইতে তোমার অস্ত্রগুলি প্রার্থনা করি।'

কৃতীশ্বর অতি আনন্দের সহিত নিজের যাবতীয় অস্ত্র গিরণকে অর্পণ করিয়া বলিলেন—'মনে বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিবার অবসর পাইলাম না।"

গিরণ কৃতীশ্বরের অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতির জন্য তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন—"ভাই, তুমি প্রাসাদে ফিরিয়া যাও। আমি যতদিন না সেই নরাধমের সন্ধান করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ আর তাহার নিজমুখ হইতে তাহার পরিচয় লইতে পারিব, ততদিন আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।

কৃতীশ্বর চলিয়া গেলে গিরণ, যে পথ দিয়া সেই অশ্বারোহী গিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মস্তকের উপর তখন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মার্ত্তণ্ড। ক্ষুৎপিপাসায় তাঁহার শরীর অবসন্ন।

অশ্বের গতি মন্থর হইয়া আসিয়াছে। রাজপুত্র কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া তিনি যখন একটি গ্রামে আসিয়া পড়িলেন, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমে হেলিয়াছেন। গ্রামটি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহা যেন একটি বৃহৎ কামার শালা বলিয়া তাঁহার নিকট বোধ হইল। প্রায় প্রতি গৃহেই অস্ত্র শস্ত্র শাণিত ও বর্ম্মাদি পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহাতে যে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে গিরণের কর্ণ বধির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

গিরণ মনে করিলেন, এই রাজ্যের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র বুঝি এইখানে প্রস্তুত ও মেরামত হয়। আততায়ীর সহিত যুদ্ধ কালে শরীরাবরণের জন্য তাঁহার একটি বর্ম্ম আবশ্যক ছিল। প্রথমে যাহাকে দেখিতে পাইলেন সে একটি বর্ম্ম তাঁহাকে বিক্রয় করিবে কি না এই প্রশ্ন করায়, সে তাহার কাজ হইতে বিরত

না হইয়া এবং মুখ না তুলিয়াই বলিল, "কাল বাসন্তী বিজয়, বিরক্ত করিবেন না।'

গিরণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া আর এক জনের নিকট গিয়া বর্ম্ম ক্রয়ের ইচ্ছা জানাইলে সে ঐরূপ উত্তর দিল। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐ একই উত্তর; তা'র বেশী একটী কথাও কেহ বলে না। শেষে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তিনি একজনকে বলিলেন, তোমাদের বাসন্তীবিজয়টা কি, আর তোমরা গ্রাম শুদ্ধলোক অস্ত্রশস্ত্রের এরূপ সংস্কার করিতেছ কেন, তাহা যদি আমায় না বল তাহা হইলে এখনই তোমার শিরশ্ছেদ করিব।" এই বলিয়া গিরণ কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিলেন।

সে ব্যক্তি ভীত হইয়া বলিল,—"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, আমার কথা কহিবার অবসর নাই। আপনি বিদেশী দেখিতেছি, তাই বাসন্তীবিজয় কি জানেন না। সে এক বিরাট যুদ্ধ ক্রীড়ার অভিনয়; কালই হইবে। সেই যুদ্ধে যে সকল বীর যোগদান করিবেন তাঁহাদেরই এই সকল অস্ত্রশস্ত্র। বর্ম্মের

জন্য আপনাকে অন্যত্র চেষ্টা দেখিতে হইবে। অনতিদূরেই রাজা অনিলের প্রাসাদ দেখিতে পাইবেন। তিনি এখন এদেশের রাজা না হইলেও, ওখানে আশ্রয় ও বর্ম্মাদি পাইতে পারেন।” অতি তাড়াতাড়ি এ কয়টি কথা বলিয়া লোকটি নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## আশ্রয়

তপনদেব তখন দিগন্ত-কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। পাখীরা গাছের উপর কলরব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রভাতে যে বিহঙ্গকূজন কুমারের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, এখন তাহাই তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল।

সমস্ত দিন অনাহারে পথ পর্য্যটনে তাঁহার শরীর এরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার আর চলিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে কেহই অশ্রয় দিতে চাহে না দেখিয়া তিনি সেই ব্যক্তির নির্দ্দেশ অনুসারে রাজা অনিলের প্রাসাদাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

দিনের আলো মিলাইয়া আসিয়া যখন গোধূলির অল্পান্ধকারে পরিণত হইল, তখন গিরণ এক প্রাসাদ-

তুল্য বৃহৎ জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারদেশের পুরোভাগে বৃদ্ধ শুভ্র কেশ রাজা অনিল পদচারণা করিতেছিলেন। হস্তদ্বয় পশ্চাদ্ভাগে সংযুক্ত করিয়া ভূমিবিলগ্নদৃষ্টিতে তিনি যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। অশ্বের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিলে তিনি সম্মুখে একজন অশ্বারোহী যুবক দেখিয়া স্নেহ করুণ স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'বৎস, তুমি এখন এই সন্ধ্যাকালে কোথায় যাইতেছ? তোমাকে বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে।'

গিরণ বলিলেন,—'মহাশয় আমি এই রাত্রের জন্য আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছি।'

'এস বৎস, এই দরিদ্রের গৃহে যাহা আছে, তাহাই দিয়া অতিথি সৎকার করিয়া কৃতার্থ হইব।' এই বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহ-মধ্যে লইয়া চলিলেন। অশ্বটিকে যথাস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া গিরণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

সেই প্রকাণ্ড পুরী জনমানবশূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চত্বরে ও প্রাঙ্গণে বড় বড় ঘাস ও কাঁটা গাছ জন্মিয়াছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীর ও স্তম্ভ সমূহ অনেক স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় সেই সকল স্থানে নানা বিধ গুল্ম লতাদিতে সমাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্তই শ্রীহীন। রাজপ্রাসাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মী যে কত চঞ্চলা তাহা বুঝিতে পারিয়া গিরণ মনে বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব করিলেন।

কিন্তু একি! এই নির্জ্জনপ্রায় পুরী মধ্যে অপ্সরা বিনিন্দিত কণ্ঠে কে গান গায়? কি মধুর, অথচ কি করুণ সুর! বিজন গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই অপূর্ব্ব স্বর লহরী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গিরণ চলিতে চলিতে সহসা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সঙ্গীতসুধা পান করিতেছেন দেখিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"ও আমার মেয়ে অনিন্দ্যা। মা আমার

বড় সুন্দর গায়!—অনু, অনু, মা এ ঘরে একটা আলো দিয়ে যা ত।”

সঙ্গীত থামিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই দীপহস্তে এক অলোকসামান্য রূপবতী রমণী তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন। বয়স তাঁহার সপ্তদশ বৎসর হইবে; রূপের ও লাবণ্যের বন্যায় সমস্ত অঙ্গ ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মুখ খানি এমনই সরলতা মাখা, দৃষ্টি এমনই সহজ ও মধুর যে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যে, বয়স তাঁহার দেহে সৌন্দর্য্য আনিয়া দিয়াছে মাত্র, কিন্তু চিত্তবৃত্তির উপর আপন অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সমর্থ হয় নাই।

পিতার সহিত একজন অপরিচিত যুবককে দেখিয়া তরুণী ত্রস্তভাবে প্রদীপটি সেখানে রাখিয়াই পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু পিতা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—“ইনি আজ আমাদের গৃহে অতিথি; অতিথির কাছে লজ্জা কি মা! যাও, আলোটি ঐখানে রাখিয়া ইঁহার আহারের উদ্যোগ করগে।”

অনিন্দ্যা পিতার আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেলেন। গিরনের মুগ্ধ নয়ন তাহার অনুবর্ত্তী হইল। যাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি মোহিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া সম্পূর্ণ আত্মহারা হইলেন। এ যেন স্বর্গবাসিনী কোন দেবকন্যা। এত রূপ কি মানুষের হয়! আলোক হস্তে বালিকা যখন তাহাদের অগ্রগামিনী হইয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন গিরনের মনে হইতেছিল যেন প্রদীপের আলো তাহার রূপের কাছে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

— ——

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## বাসন্তী বিজয় কি ?

কক্ষমধ্যে উভয়ে উপবেশন করিলে, বৃদ্ধ বলিলেন "এক কালে অতিথির সমুচিৎ সৎকার করিবার সামর্থ্য আমারও ছিল, কিন্তু এখন আর আমার কিছুই নাই ; ঐ মেয়েটিই আমার সম্বল। আহা, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! মাকে আমার অপাত্রে দিতে পারি নাই বলিয়াইত আমাদের এই দুর্দ্দশা।"

গিরণ বলিলেন, 'কিরূপে আপনারা এই রূপ দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। যদি আমার সাধ্যে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমার আশ্রয় দাতার নষ্ট সৌভাগ্য পুনরুদ্ধারে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'এখনই বলিতেছি ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমার পরিচয় পাইলে বড় সুখী হইব।'

গিরণ তখন আপনার পরিচয় ও 'সেদিনকার

ঘটনা আদ্যোপান্ত সমস্ত রাজা অনিলের নিকট বলিলেন। কোশল রাজ বীরসেনের পুত্র গিরণ,—যাঁহার বারত্বের কাহিনী তিনি পূর্ব্বে অনেক বার শুনিয়াছিলেন—তিনি যে ঘটনা চক্রে তাঁহার অতিথি হইয়াছেন, ইহাতে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিলেন। অতঃপর সেই দুর্ব্বৃত্ত অশ্বারোহীর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আবেগরুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমার বোধ হয় এই সেই পাপাত্মা।"

গিরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন পাপাত্মা" ?

বৃদ্ধ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। শুন, আমি সমস্তই বলিতেছি।"

পলিতকেশ রাজা অনিল তখন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি এই প্রদেশের রাজা ছিলাম ; আর আজ আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজাও আমার চেয়ে ধনী, আমার চেয়ে সুখী।" বৃদ্ধের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত

পরে পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধ সেনাপতি রুদ্রসেন যখন তাঁহার বালকপুত্রকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, তখন কি স্বপ্নেও জানিতাম যে গৃহে কাল সাপকে আশ্রয় দিলাম? সে আজ দশ বৎসরের কথা। তখন সে চৌদ্দ বৎসরের বালকমাত্র। তখন সেই পিতৃহীন বালকের সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার স্নেহের ও ক্ষমার চক্ষে দেখিতাম। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার চরিত্রের নানা দোষ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি সে যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ সুনিপুণ হইয়াছিল বলিয়া সে যখন বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন তাহাকেই আমার সেনাপতি পদ প্রদান করিলাম।

"সেই সময় আমার কন্যার জন্য সুপাত্রের সন্ধান করিতে ছিলাম। অনিন্দ্যার রূপগুণের কথা শুনিয়া কত রাজকুমার তাহার পাণিপ্রার্থী হইতে ছিল। আমার কিন্তু কাহাকেও আমার কন্যার উপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছিল না। যতদিন না, সর্ব্বগুণসম্পন্ন কাহাকেও পাই, ততদিন আমার

মেয়ের বিবাহ দিব না, এই রূপ আমি মনস্থ করিয়াছিলাম।

“আমি যখন এইরূপ নানাস্থানে পাত্রের সন্ধান করিতেছি, তখন দুরাত্মা—আমি তা'র নাম করিব না, কারণ তুমি তা'র নিজের মুখ থেকে তা'র নাম বাহির করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ—দুরাত্মা আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমি তাহার এই প্রস্তাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলাম যে, দ্বিতীয়বার যদি তাহার মুখে এই কথা শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাহাকে এ রাজ্য হইতে তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। পাপিষ্ঠ তখন সৈন্যগণকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। তাহার পর এক-দিন বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া তাহাদের সাহায্যে রাজপুরী অধিকার করিয়া আমাদিগকে বন্দী করিয়া ফেলিল। আমার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া সৈন্যদের প্রচুর উৎকোচ দিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের বশীভূত করিয়া রাখিল। তখন

আবার আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, যদি তাহার সহিত অনিন্দ্যার বিবাহ দিই তাহা হইলে রাজ্য ফিরাইয়া দিবে, না হইলে আমাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিবে এবং বলপূর্ব্বক আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে। আমি অত্যন্ত ঘৃণার সহিত এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে, সে আমাকে নানারূপে শাসাইয়া চলিয়া গেল।

"এদিকে আমার রাজভক্ত প্রজাগণ দুরাত্মার কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানা-রূপে চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইতেছিল। নরাধম তখন এখানে থাকা নিরাপদ নয় ভাবিয়া এখান হইতে কিয়দ্দূরে একস্থানে নিজের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল, এবং আমাকে এখানে এই অবস্থায় রাখিয়া সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া সেইখানে রাজ-ধানী স্থাপন করিল। আমি যাহাতে অন্যত্র পলা-ইতে না পারি কিম্বা অন্য কোন রাজার নিকট হইতে সাহায্য না পাই, তজ্জন্য সে চারিদিকে

সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় সে আশা করিয়াছিল যে, শীঘ্রই আমার মত পরিবর্ত্তিত হইবে; তাই সে আমাকে প্রাণে বধ করে নাই। আর বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া আমার কন্যার মন পাইবে না, এটুকু জ্ঞান ও বোধ হয় তাহার ছিল; তাই এ পন্থাও অনুসরণ করে নাই।

"ইতিমধ্যে বাসন্তী নাম্নী একটি সুন্দরী পতিতা রমণীকে সে ভোগ্যানারীরূপে গ্রহণ করিয়াছে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূর্ণিমার দিন এই রমণীকে উপলক্ষ করিয়া সে এক উৎসবের আয়োজন করিয়া থাকে; তাহারই নাম দিয়াছে "বাসন্তী বিজয়"। সে প্রকাশ্য ক্রীড়াঙ্গনে এই পতিতা যুবতীকে দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া ঘোষণা করে। যাঁহারা তাহার এই দম্ভপূর্ণ ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া স্ব স্ব পত্নী বা প্রণয়িণীকে অধিকতর সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারা তখন তাহার সহিত যুদ্ধে আহূত হন। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত এরূপ বলশালী

ও রণকুশল যে সে প্রতিবারেই প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে পরাজিত করিয়া বাসন্তীর গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কাল বাসন্তী পূর্ণিমা; অদূরেই ক্রীড়াঙ্গন নির্ম্মিত হইয়াছে।”

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## আনন্দাশ্রু

বৃদ্ধ আরও বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু এই সময় অনিন্দ্যা উভয়ের আহার্য্য আনিয়া উপস্থিত হইলেন। অনিল তখন কন্যাকে বলিলেন—"মা, ইনি কোশলরাজপুত্র গিরণ। ইঁহার কথা আগে অনেকবার আমার মুখে শুনিয়াছ।"

বিস্ময়ে ও লজ্জায় অনিন্দ্যার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। এই সেই কুমার গিরণ! যাঁহার লোকাতীত বারত্বের কাহিনী তাঁহার বালিকাহৃদয়ে কতবার বিস্ময় ও পুলকের তরঙ্গ তুলিয়াছে! কিন্তু সেই বিস্ময়বিজড়িত পুলকের অন্তরালে যে আর কোন ভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে লুক্কায়িত ছিল, এমন ত কখনও সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ সেই গিরণকে দেখিয়া তাঁহার একি ভাবান্তর হইল? কোথা হইতে এক নূতন ভাবের বন্যা

আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তোলপাড় করিয়া তুলিল ?

অনিন্দ্যা কক্ষের এক ক্ষীণালোকিত পার্শ্বে নত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি তখন কি করিবেন, দাঁড়াইয়া থাকিবেন কি চলিয়া যাইবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পরিতেছিলেন না। পিতা শীঘ্রই তাঁহাকে এই সমস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—"মা, কুমারের ঘোঁড়াটিকে কিছু আহার দিয়ে এস।"

গিরণ তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বলিলেন,—"না না, তা'র কোন প্রয়োজন নাই। ঘোঁড়াটাকে যেখানে বাঁধিয়া আসিয়াছি সেখানে প্রচুর ঘাস আছে। তা'কে আর কিছু দিতে হইবে না।" এই বলিয়া তিনি একবার আবেগভরা দৃষ্টিতে অনিন্দ্যার দিকে চাহিলেন। আর তিনি যখন এই কথাগুলি বলিতে ছিলেন তখন অনিন্দ্যার ও দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ ছিল। চারি চক্ষুর যখন মিলন হইল, তখন অনিন্দ্যা আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না।

আহারান্তে উভয়ে উপবেশন করিলে অনিল

কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তখন তুমি যে গানটি গাহিতে ছিলে, কুমারকে সেটি শুনাইয়া দাও। যাঁহার কথা শুনিতে এত ভালবাসিতে, আজ তিনি স্বয়ং উপস্থিত। তাঁহার কাছে আর লজ্জা কি?"

এই বার তাঁহার বিষম পরীক্ষা! লজ্জা ভয় ও আনন্দ যুগপৎ তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হৃদয় দুরু দুরু করিতেছে। কণ্ঠ দিয়া কিরূপে স্বর বাহির হইবে? কিন্তু পিতার আদেশ পালন করিতেই হইবে। ত্রস্ত চরণে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে গিয়া কম্পিত হস্তে তিনি বীণাটি গ্রহণ করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বীণার ঝঙ্কারে স্বর মিলাইয়া গাহিলেন—

কাহারে কখন ঠেলে চলে যাও,
ফেলে চলে যাও আঁধারে,
আবার কাহার অনুরাগ পরশে
থাক অনায়াসে বাঁধারে!
অয়ি চঞ্চলা কমলা! কেমন গো তব এ ছলা,
সুখের কুঞ্জ হতে সে অতুল
এনেছ অকূল পাথারে।

যাও তবে দূরে চলিয়া, আসিও না পুনঃ ছলিয়া,
হাসির বিজুলি হানিয়া তোমার
বাড়ায়োনা আর ব্যথারে।

গীত থামিল, কিন্তু তখনও যেন গিরণের কর্ণ কুহরে সেই বিষাদ মাখা মধুর স্বর ধ্বনিত হইতে ছিল। এই শোচনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কি কোন প্রতিকার তিনি করিতে পারিবেন না? তাহা হইলে তিনি কি জন্য অস্ত্র ধারণ করেন! তাঁহার সেই অপমানের কথা, সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। এখন পর্য্যন্ত সেই নরকের কীট জীবিত আছে! তিনি অতিকষ্টে মনের আবেগ দমন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "উপযুক্ত অবসর পাইয়াছি। কাল আমি তাহাকে দন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়া এই অত্যাচারও আমার অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

এই কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন 'বৎস, তোমার যদি বিবাহ না হইয়া থাকে, কিম্বা বাগ্‌দত্তা প্রণয়িণী না থাকে, তাহা হইলে এই যুদ্ধক্রীড়ায় তোমার যোগদান করিবার অধিকার থাকিবে না। ইহাই নিয়ম।"

গিরণের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। তখনই প্রবল চেষ্টায় লজ্জা ও সঙ্কোচের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এখনও অকৃতদার। কিন্তু—"

"কিন্তু কি, বৎস ?" বলিয়া অনিল উৎসুক ভাবে কুমারের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"কিন্তু আপনার কন্যাকে কি আমি পত্নী রূপে পাইবার আশা করিতে পারি না ? "ধীরে ধীরে নত মুখে গিরণ এই কয়টি কথা বলিলেন।

বৃদ্ধের নিকট এই প্রস্তাব যেন অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। কোশলের যুবরাজ গিরণকে যে তিনি জামাতৃরূপে পাইবেন এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন নাই। আর এখন তিনি কপর্দ্দক হীন। তিনি বলিলেন, 'একি বলিতেছ, কুমার ? আমার ন্যায় ভাগ্যহীন দরিদ্রের সহিত তোমার পিতা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হইবেন কেন ! তুমি কি তোমার পিতার অমতে বিবাহ করিতে চাও ?" গিরণ এবার উত্তেজিত

স্বরে বলিলেন, "কাল আর আপনি রাজ্যহীন থাকিবেন না। হয় আমি দুরাত্মাকে বধ করিয়া আপনার রাজ্য উদ্ধার করিব, নয় আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

বৃদ্ধ তখন গদ্ গদ্ স্বরে কহিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, বৎস, সফলকাম হও। তোমার ন্যায় পাত্রে আমি কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি, এ যে আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। এই সুখ আমার কপালে ছিল বলিয়াই বুঝি ভগবান আমাকে দুরবস্থায় ফেলিয়াছেন। হায়! এ সময় তা'র মাতা কোথায় ?" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন,—"তোমায় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, এই দৈন্য ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার সহধর্ম্মিনী আজ দুই বৎসর হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজ এখন তাঁহার কথা মনে পড়িতেছে।"

অনিল উঠিলেন এবং গিরণকে শয়নগৃহ দেখাইয়া দিয়া নিজে শুইতে গেলেন।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## পণরক্ষা

আজ বাসন্তী বিজয়।

সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই ক্ষুদ্র শ্রীপুর নগরটি জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতেই ক্রীড়া আরম্ভ হইবে। রাজপথ সকল জন কোলাহলে মুখরিত। আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই এই যুদ্ধাভিনয় দর্শন করিবার জন্য চলিয়াছে। সকলেরই মুখে ব্যগ্রতাও ঔৎ-সুক্যের চিহ্ন।

নগর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উত্তর দক্ষিণে ক্রোশার্দ্ধস্থান জুড়িয়া যুদ্ধাঙ্গন প্রস্তুত হইয়াছে। উত্তর প্রান্তে এক বহুমূল্য সিংহাসন, অপর সীমায় যোদ্ধ্‌গণের প্রবেশপথ; আর চতু-র্দ্দিকে বৃত্তাকারে দর্শকগণের বসিবার মঞ্চ। দূর-দেশ হইতে আগত রাজা ও রাজকুমারগণের শিবির চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

পূর্ব্বাকাশ যখন নবোদিত রবির কিরণজালে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন চতুর্দ্দিকের মঞ্চগুলিতে আর তিলধারণের স্থান রহিল না। অগণিত লোক এই দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রমণীকুলকলঙ্ক বাসন্তীর গর্ব্ব চূর্ণ করিতে এবার কোন্ কোন্ বীর অগ্রসর হন, সতীনারী গণের মর্য্যাদা এবার প্রতিষ্ঠিত হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য অসংখ্য পুরাঙ্গনা সমবেত হইয়াছিল।

তূর্য্য-নিনাদ হইল। লোকসঙ্ঘের মধ্যে চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দিল। যুদ্ধসাজে সজ্জিত এক যুবক দৃপ্ত অশ্বে আরোহন করিয়া অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করিল। পার্শ্বে ভিন্ন অশ্বে আরূঢ়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিতা এক সুন্দরী রমণী। এই রমণীই বাসন্তী, আর যুবকটি এই প্রদেশের বর্ত্তমান অত্যাচারী রাজা।

আর কোথাও কোনরূপ শব্দ নাই। অঙ্গন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইজনেই অশ্ব হইতে অবতরণ

করিল ; এবং যুবক রমণীকে লইয়া গিয়া সিংহাসনে বসাইল। অতঃপর পুনরায় অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল--“আমি এই সিংহাসনোপবিষ্টা বাসন্তীকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি; যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত থাকেন, আমি তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।

তাহার কথা শেষ না হইতে না হইতেই দ্বার সন্নিকট হইতে গর্ব্বিতকণ্ঠে উত্তর হইল ‘রে দুর্ম্মতে, আমার নিকট দণ্ডায়মানা এই নারী বাসন্তী অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠা।’ সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দ্বারের পার্শ্বে অশ্বের বল্গা ধরিয়া দণ্ডায়মান রণসাজে সজ্জিত এক যুবকের মুখ হইতে নির্ভীক উত্তর বাহির হইল; তাঁহার পার্শ্বে বৃদ্ধ রাজা অনিল কন্যা অনিন্দ্যার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গিরণ আর কাল বিলম্ব না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া উন্মুক্ত তরবারি করে অরাতির প্রতি ধাবিত

হইলেন। ঘোর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই সমান যোদ্ধা; কিছুক্ষণ কেহই অপরকে পরাজয় করিতে পারিল না। অবশেষে এক বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পাপিষ্ঠ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। গিরণও সেই মূহুর্ত্তে এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং তাহার বুকের উপর বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'কাপুরুষ! এইবার তোর পরিচয় বল। তারপর এই তরবারি তোর বুকে বসাইয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

ঊর্দ্ধোত্থিত কৃপাণ হস্তে গিরণ যখন শত্রুর বক্ষের উপর আরূঢ়, কোমল হৃদয়া অনিন্দ্যা তখন পিতাকে করুণস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, কুমারকে পতিত শত্রুর প্রাণবধ করিতে নিষেধ করুন।' অনিল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সে কি, মা? পাপাত্মা আমাদের কি পর্য্যন্ত না দুর্গতি করিয়াছে! তা'র প্রাণ রক্ষার জন্য অনুরোধ!"

কম্পিত কণ্ঠে কন্যা বলিলেন, 'পাপীর সাজা ভগবান দিবেন; আপনি উহাকে রক্ষা করুন

তাঁহার চক্ষে, মুখে, একটা অব্যক্ত বেদনার ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

অনিল কন্যাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন; তিনি তাঁহার আব্দার উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে গিয়া কুমারকে কন্যার অভিলাষ জানাইলেন।

গিরণ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই তাঁহার করতলগত শত্রু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল 'না, না, আর আমি বাঁচিতে চাই না! আমায় বধ কর! আমি আমার আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আরও অনেক মহাপাপ করিয়াছি, আর আমার বাঁচিয়া প্রয়োজন নাই। আমার পরিচয় জানিতে চাও? এই যে ঋষির ন্যায় রাজা অনিল, যাঁহার পক্ষ লইয়া তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে, আমি ইঁহারই সেনাপতি রুদ্রসেনের পুত্র অদীরণ; ইঁহারই অন্নে পালিত, ইঁহারই যত্নে লালিত হইয়া, ইঁহাকেই রাজ্যচ্যুত করিয়াছি। আর ইঁহার দেবী-স্বরূপিণী কন্যা, যাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই আমি এই অধর্ম্মা-

চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, আর যিনি আজ তাঁ'র পরম শত্রুর প্রাণভিক্ষা চাহিতেছেন, তাঁহাকে এতদিন বলপূর্ব্বক বিবাহ করি নাই কেন জান? বল-প্রকাশে আমি তাঁর হৃদয় পাইব না, তাই প্রতি বৎসর এই রকম একটা কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয়ে নিজের বীরত্ব দেখাইয়া তাঁহার হৃদয় আমার দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতাম। যদি কৃতকার্য্য না হইতাম, উনি যদি আর কাহারও প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেন, তাহা হইলেও আমার আশা ছিল যে আমার এই আহ্বানে আমার সহিত সে যুদ্ধ করিতে আসিবে; আমি তখন অনিন্দ্যার সম্মুখে তাহাকে হত্যা করিয়া উঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতাম। তাই আজ যখন তুমি তাঁহার পক্ষ হইতে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলে, তখন আমার মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল। কে জানিত যে তুমি ভগবানের বিচারদণ্ড আমার উপর নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছ? আজ আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে। হায়! আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?" অনুতপ্ত

পাতকীর নয়ন বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল ; সে আর কথা কহিতে পারিল না।

গিরণ ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে চুপ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'যাঁহাদের তুমি সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দুর্গতির এক-শেষ করিয়াছিলে, আজ তাঁহাদেরই কৃপায় তোমার প্রাণরক্ষা হইল। আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতাপেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। এখন তুমি রাজা অনিলকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দাও, আর তাঁহার ও অনিন্দ্যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন পরহিতব্রতে উৎসর্গ কর। এ রাজ্যে আর তুমি থাকিতে পাইবে না। রাজা ধর্ম্মপালের আশ্রয় ভিক্ষা করগে ; তাঁহাকে তোমার জীবনের ইতিহাস বলিবে, আর তোমার এই অত্যা-চারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার অধীনে অত্যাচারীর দমনে নিজেকে নিয়োজিত করিবে।'

অঙ্গীকার স্বীকৃত হইল। জানু পাতিয়া অনিল ও অনিন্দ্যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন

সেই বিপুল জনসঙ্ঘ হইতে সহস্র কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া উত্থিত হইল 'জয়, রাজা অনিলের জয়।'

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ

## সন্দেহ

অধর্ম্মের পতন হইল। রাজা অনিল স্বরাজ্য ফিরাইয়া পাইলেন। শুভদিনে শুভ লগ্নে অনিন্দ্যার সঙ্গে কুমার গিরণের বিবাহ হইয়া গেল। দূতমুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া এবং যথোপযুক্ত ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া গিরণের পিতা বীরসেন ও মহারাজা ধর্ম্মশীল বিবাহের সময় শ্রীপুর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বহুদিন ধরিয়া আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। প্রজাগণের আনন্দের অবধি রহিল না। ক্ষুদ্র নগরটা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ রাজা অনিল অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যাকে বিদায় দিলেন।

রাজা বীরসেন পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নববধূ দেখিয়া গিরণের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলেই আনন্দিত হইল।

শ্বশুরালয়ে সকলেই তাঁহার গুণের বশীভূত হইয়া পড়িল। সর্ব্বাপেক্ষা হইলেন গিরণ নিজে। অনিন্দ্যা তাঁহার চক্ষের মণি স্বরূপ হইলেন ; এক দণ্ড চক্ষের আড়াল হইলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন। ক্রমশঃ তিনি এতদূর স্ত্রৈণ হইয়া পড়িলেন যে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনে তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় আগ্রহ রহিল না। বীরোচিত ক্রিয়া কলাপে তাঁহাকে এই রূপ পরাঙ্মুখ দেখিয়া এখন অনেকেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। গিরণ এই সকল নিন্দা গ্রাহ্যই করিতেন না। কিন্তু ইহা যখন তাঁহার পত্নীর কর্ণ গোচর হইল তখন অনিন্দ্যা ইহাতে বিলক্ষণ কষ্ট অনুভব করিলেন। ক্ষত্রিয় বীর গিরণ যে তাহার জন্য কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া সকলের নিন্দাভাজন হইতেছেন, পতি হিতাকাঙ্ক্ষিণী অনিন্দ্যা তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন ? কিন্তু পতিকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন তাহা ভাবিয়া আকুল হইলেন। গিরণ ত তাঁহার চেয়ে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ; তিনি কি, নিজের অবস্থা বুঝেন না ? তাই তিনি বুঝিতে-

ছেন কই ? দিন দিন সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রৈণ নাম কিনিতেছেন। পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী ইহা দেখিয়া কি রূপে সুখী হইতে পারে ? এইরূপ নানাচিন্তা অনিন্দ্যার ক্ষুদ্র হৃদয়টি আলোড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতেন না। মনের মধ্যে নিরন্তর এক গুরুভার বহন করাতে তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নষ্ট হইল।

ইহার ফল অতি ভয়ঙ্কর হইল। যাহাকে পাইয়া গিরণ আর সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, যাহার মুখশ্রীই তাঁহার জীবনের একমাত্র চিন্তা হইয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রিয়তমা পত্নী অনিন্দ্যার মুখে যখন বিষাদের ছায়া দেখিলেন, তখন এক দারুণ যন্ত্রণা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তখন তিনি আরও বেশী করিয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জনে চেষ্টিত হইলেন ; কর্ম্মজগতের সঙ্গে তখন পর্য্যন্ত যে একটা ক্ষীণ বন্ধন ছিল, এখন তাহাও সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন হইল। অনিন্দ্যা ইহাতে সুখী হওয়া দূরের কথা, তাঁহার বিষাদ আরও বর্দ্ধিত হইল।--গিরণ পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে

লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে নানারূপ অমূলক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তবে কি অনিন্দ্যা আমাকে ভালবাসে না! আমাকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিতেছে না? কি হইল? তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল; তিনি আর ভাবিতে পারিলেন না। দুর্ব্বিষহ সন্দেহ বিষে তাঁহার হৃদয় মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল।

---

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## তবে কি সন্দেহ সত্য ?

এইরূপে কিছুদিন যায়। উভয়ের অজ্ঞাতসারে ক্রমেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সুখের নন্দন ক্রমেই মরুভূমিতে পরিণত হইতেছিল।

মন যখন সন্দেহজালে আচ্ছন্ন থাকে, তখন বিচারশক্তি চলিয়া যায়। অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটি, সামান্য কথা, অর্থহীন আকারেঙ্গিতটি পর্য্যন্ত তখন সন্দেহের অনুকূল বলিয়া মনে হয়। সহসা এক দিন এই ধূমায়িত অশান্তি প্রজ্জলিত হইয়া মহান অনর্থ সংঘটিত করে।

চৈত্রের নিশি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখনও জগৎ সুপ্তিমগ্ন। দু'একটি পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুক্ত বাতায়ন দিয়া যখন বসন্ত ঊষার স্নিগ্ধ বায়ু গিরণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে

ছিল, রাজকুমার তখনও নিদ্রিত। কিন্তু অনিন্দ্যার ঘুম পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কুসুম কোমল হৃদয়ে চিন্তার কীট প্রবেশ করিয়াছে। স্বামী যে তাঁহার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সকলের নিন্দা-ভাজন হইতে বসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার চিন্তা ও কষ্টের কারণ; তিনি যে স্ত্রীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সরলা অনিন্দ্যার ধারণায় তাহা কখনও আসে নাই। কিরূপে তাঁহাকে পুন-রায় কর্ত্তব্যের পথে আনিতে পারা যায়, প্রভাতকল্পা রজনীতে নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া সাধ্বী স্ত্রী তাহাই ভাবিতেছিলেন।

ঊষার ক্ষীণালোক যখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, দুঃখ ভারাক্রান্তা অনিন্দ্যা তখন স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন--'প্রিয়তম, আমার জন্য সকলে তোমার নিন্দা করে! আমার বুকে যে তাহা শেলসম বিঁধিতেছে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আর আমি তুচ্ছ

পাপিষ্ঠা যে আমিই পতির কলঙ্কের কারণ হইতেছি। হায়! আমার সতীত্বের গৌরব এখন কোথায়?'

তখন তাঁহার মনের মধ্যে এমন এক প্রবল আবেগের বন্যা আসিয়াছিল যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার চিন্তার শেষাংশটা বাক্যে ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়ে গিরণেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল। 'পাপিষ্ঠা' 'কলঙ্ক' প্রভৃতি কয়েকটি কথা এবং শেষের সমগ্র বাক্যটি তাঁহার কর্ণে গিয়াছিল। সন্দিগ্ধ চিত্ত গিরণ যখন তন্দ্রাঘোরে এই কয়টি কথা শুনিলেন, তখন পত্নী যে অপরের প্রতি আসক্তা, এবং পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল অনুতাপ আসিয়া মাঝে মাঝে ক্ষণ-কালের জন্য পাপীয়সীর হৃদয় অধিকার করে বলিয়াই যে তাহার মুখ হইতে অনবধানে এই সকল কথা বাহির হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইল। তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। এক ভীষণ সঙ্কল্প তাঁহার মনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গিরণ কোন কথা না কহিয়া পত্নীর প্রতি শুধু

এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, এবং পরক্ষণেই শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে ছিলেন ; কিন্তু কি মনে করিয়া একটু দাঁড়াইলেন, এবং স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—'অশ্বারোহণে আমার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।' এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। অনিন্দ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ; কিন্তু স্বামীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার বড় ভয় হইল।

---

## নবম পরিচ্ছেদ

### নিরুদ্দেশ যাত্রা

পাঠিকাগণকে মনে রাখিতে হইবে যে আমরা এগার শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। তখন বঙ্গরমণী বর্ত্তমান কালের ন্যায় অবরোধ প্রথার কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ ছিলেন না। অন্তঃপুরই অতি প্রাচানকাল হইতে ভারত ললনার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সত্য; কিন্তু প্রয়োজন মত তাঁহারা প্রকাশ্য স্থানে পুরুষের সম্মুখে বহির্গত হইতে কোন কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

সুতরাং গিরণ যখন প্রত্যূষে স্ত্রীকে লইয়া অশ্বারোহণে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তাহাতে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। দুই জন পাশাপাশি দুইটি অশ্বে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিলেন। কাহারও মুখে একটিও কথা নাই। ক্রমে নগর ছাড়াইয়া তাঁহারা একটি বনের মধ্যে

প্রবেশ করিলেন। গিরণ তখন পত্নীকে অগ্রগামিনী হইতে আদেশ করিলেন, এবং অতঃপর তাঁহাকে আর কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

কিছু দূর এইরূপে অগ্রসর হইলে অনিন্দ্যা দেখিতে পাইলেন যে অদূরে কয়েকটি বৃক্ষের অন্তরালে তিনজন সুসজ্জিত অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহাদের ভীষণ আকার ও সন্দেহ জনক ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনিন্দ্যা শঙ্কিতা হইলেন। তাহারা যে দুষ্টলোক, এবং দস্যুতাই তাহাদের উদ্দেশ্য তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়া গিরণকে সাবধান করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন। কারণ তিনজন সুসজ্জিত অশ্বারোহী দস্যু যদি অতর্কিতভাবে একজনকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহার প্রাণ সংশয়। এ দিকে আবার স্বামীর কঠিন আদেশ; 'না হয় তিনি আমার উপর অসন্তুষ্টই হইবেন তাই বলিয়া কি তাঁহাকে আসন্ন বিপদের কথা জানাইব না!' এই ভাবিয়া অনিন্দ্যা দাঁড়াইলেন; এবং স্বামী নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহাকে

সম্মুখের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন। দস্যুরা তখন ফিস ফিস করিয়া কি কথা কহিতেছিল।

গিরণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন — 'তোমাকে কি আমার সঙ্গে কথা কহিতে বারণ করি নাই? তোমাকে এই অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তিনটা কেন, এ রকম দশটা দস্যুও আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। আমার বাহুতে যে এখনও বল আছে তা'র প্রমাণ এখনই পাইবে।' এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বিমূঢ়া সাধ্বীর গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া তখন যে অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করিযাছিল, ক্রোধান্ধ গিরণ তাহা দেখিতে পাইলেন না।

নিমেষ মধ্যে সেই তিনজন দস্যু ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু ধন্য তাঁহার শিক্ষা! তাঁহার ভীম বর্মাঘাতে দুইজন অবিলম্বে ধরাশায়ী হইল। তৃতীয় দস্যু প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

শত্রু নিহত হইল। গিরণ তখন তাহাদের

অশ্বগুলি ধৃত করিলেন; এবং তাহাদের পৃষ্ঠে দস্যুগণের অস্ত্রশস্ত্র স্থাপিত করিয়া দুইটিকে এক সঙ্গে পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া দিলেন।

অনিন্দ্যা স্বামীর কৃতকার্য্যতায় অন্তরে যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেও সাহস করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার রূঢ় ব্যবহারে তিনি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সে সমস্ত ভুলিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিলেন। অতি সঙ্কোচের সহিত কয়েকপদ অগ্রসর হইয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে গিরণ পূর্ব্ববৎ স্নেহশূন্য স্বরে পত্নীকে বলিলেন,—'এই ঘোঁড়া দু'টাকে চালাইয়া আগে আগে চল। আবার বারণ করিতেছি, আমার সঙ্গে কথা কহিও না।'

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

## বনমধ্যে।

ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষে দুরতিক্রমনীয় ও নিবিড় লতা গুল্মাদিতে সমাচ্ছন্ন সেই গহন বন পথে একত্র সংবদ্ধ অশ্ব দ্বয়কে পরিচালিত করিতে আনন্দ্যার যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা অনেকটা লাঘব করিতেছিল। গিরণের মন এখন পৈশাচিক ভাবে পূর্ণ। যে প্রিয়তমা পত্নী এক মূহুর্ত্ত চক্ষের আড়াল হইলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন তাঁহার প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণে তিনি দুঃখিত হওয়া ত দূরের কথা, বরং মনে মনে একটু গর্ব্ব অনুভব করিলেন। যে সঙ্কল্প লইয়া তিনি বাহির হইয়াছেন, তাহারই সাধনের জন্য তিনি মনকে এই রূপ প্রস্তুত করিতে ছিলেন।

বেলা যখন দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা সেই বন প্রদেশের বহির্ভাগে এক

প্রান্তর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুইজনে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনিন্দ্যার ম্লান, শুষ্ক মুখ ও অশ্রুভারাক্রান্ত ছল ছল নয়নযুগল দেখিয়া বোধ হয় গিরনের একটু করুণার উদ্রেক হইল। আর নিজেরও পথপর্য্যটনের ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। তাই পত্নীকে আহ্বান করিয়া একটি বৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে কথা নাই। গিরণ তৃণশয্যায় শুইয়া পড়িলেন; আর বাষ্পাকুললোচনা অনিন্দ্যা অনতি দূরে বসিয়া মাঝে মাঝে এক একটী তৃণ উন্মূলন করিয়া নখদ্বারা ছিন্ন করিতেছিলেন।

এই রূপে দণ্ডাধিক কাল অতিবাহিত হইলে সম্মুখস্থ প্রান্তর পথে একটী ব্রাহ্মণ বালক দৃষ্ট হইল। সে একটী বৃহৎ পাত্রে করিয়া কি লইয়া যাই-তেছিল। গিরণ তাহাকে ডাকিলেন, এবং নিকটে শীঘ্র কোন আহার্য্য পাইবার সম্ভাবনা আছে কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক বলিল, ‘এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে

একটি পান্থাবাস আছে ; আর এই প্রদেশের রাজার প্রাসাদও এখান হইতে অধিক দূর নয়। কিন্তু আপনারা যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি, তাহাতে আপাততঃ অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি রাজার এক পাচকের পুত্র। ঐ যে দূরে শস্য ক্ষেত্র দেখিতেছেন, ঐ খানে রাজার চারিজন ভৃত্য আজ কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে গিয়াছে; আমি তাহাদের জন্য আহার লইয়া যাইতে ছিলাম। এই অপকৃষ্ট খাদ্যে যদি আপনাদের রুচি হয়, তাহা হইলে ইহা আপনারা এখন স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পারেন; আমি এখনই আবার উহাদের জন্য খাবার লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া সেই বালক আহার্য্য দ্রব্যের পাত্রটি গিরণের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

গিরণের আর তখন বিচার করিবার ক্ষমতা বা অবসর ছিল না। তিনি বালকের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন,—'বেশ কথা ; খাবারটিকে দুইভাগ করিয়া ফেল,—এক ভাগ ঐ রমণীকে দাও, অপর ভাগ আমি লইতেছি। আর তোমার

পুরস্কার স্বরূপ এই দুইটী ঘোঁড়ার যেটি তোমার ইচ্ছা বাছিয়া লও।'

বালক বিস্মিত হইয়া বলিল—'সে কি মহাশয়? এ খাবারের মূল্য ত কিছুই নয়। ইহার জন্য আমাকে এই বহু মূল্য অশ্ব দিতেছেন কেন? আর আমি লইয়াই বা কি করিব? লোকে সন্দেহ করিবে আমি ইহা চুরি করিয়াছি।'

গিরণ বলিল—'তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এ ঘোঁড়া তুমি কোথায় পাইলে, বলিও রাজকুমার গিরণ তোমাকে দিয়াছেন। নিজে যদি ব্যবহার করিতে না পার, বিক্রয় করিয়া ফেলিও, অনেক টাকা পাইবে।'

বালক যে তখন কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে রাজকুমারকে সেই অবস্থায় দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি বলিলেন—'যাও, আর বিলম্ব করিও না। বেচারাদের খাবার

আমরা খাইয়া ফেলিলাম ; উহাদের জন্য পুনরায় শীঘ্র খাবার লইয়া এস।'

বালক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একটি অশ্ব লইয়া চলিয়া গেল।

গিরণ ক্ষুধার তাড়নায় শীঘ্রই স্বীয় অংশ নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু দুঃখভারপীড়িতা অনিন্দ্যার কি আহারে রুচি আছে? তথাপি পাছে স্বামী অধিকতর অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে তিনি দুই সামান্য গলাধঃকরণ করিলেন।

গিরণ গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং পত্নীকে অনুগমন করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং অগ্রগামী হইলেন। অবশিষ্ট অশ্বটি সেই খানেই পড়িয়া রহিল। তাহারা যখন একটি পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহারা সেইখানে প্রবেশ করিলেন।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### শিবালিক

এদিকে সেই বালক গিয়া সেই দেশের রাজাকে গিরণবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা শুনিয়া একটু চাঞ্চল্যের ভাব প্রকাশ করিলেন। এখানে এই রাজার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

রাজা অনিলের রাজ্যাপহারী অদীরনের কথা পাঠক পাঠিকার নিশ্চয় স্মরণ আছে। সে তাহারই ন্যায় দুর্ব্বৃত্ত এক বন্ধু পাইয়াছিল। তাহার নাম শিবালিক, এবং সে তখন সুবর্ণ পুরের যুবরাজ। এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক অনিন্দ্যাকে লাভ করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিত। কিন্তু যখন জানিল যে অদারণ তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন সে নিজের আশা ত্যাগ করিল। অতঃপর তাহার পিতার মৃত্যু হইলে সে রাজদণ্ড গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার চরিত্রের কোন উন্নতি না হইয়া বরং উত্তরো-ত্তর অবনতি হইতে লাগিল। শেষে এমন হইল

যে রাজকার্য্য মন্ত্রির উপর ন্যস্ত করিয়া সে পার্শ্বচর-বৃন্দ পরিবৃত থাকিয়া দিবারাত্র পঙ্কিল আমোদে রত থাকিত। এই শিবালিকের রাজ্যে গিরণ সেই অপরাহ্নে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন।

শিবালিক জানিত যে গিরণের সহিত অনিন্দ্যার বিবাহ হইয়াছে; এবং বন্ধু অদারণের শোচনীয় পরাজয় কাহিনী শুনিয়া মনে মনে গিরণকে তাহার প্রধান শত্রু রূপে গণ্য করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ যখন পাচক বালকের মুখে শুনিল যে গিরণ একটি রমণীর সহিত তাহার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন কৌতূহলের সহিত একটা দুষ্ট ভাব তাহার হৃদয় অধিকার করিল। কিয়ৎকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত শিবালিক বাহির হইয়া পড়িল।

পান্থ শালায় একটা কক্ষে গিরণ সবে মাত্র আসিয়া বসিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি কক্ষ অনিন্দ্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দুই জনেই পথ শ্রমে অবসন্ন, মনোবেদনায় ম্রিয়মান। প্রাণাপেক্ষা

প্রিয়তমা পত্নীকে নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া গিরণের হৃদয় পিঞ্জর ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। আর অনিন্দ্যা স্বামীর এবম্বিধ অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়াছিলেন। দুই জনের মধ্যে কথাবার্ত্তা একেবারে বন্ধ।

এমন সময়ে শিবালিক অনুচরগণ সহ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামীর নিকটে গিরণের বার্ত্তা জানিয়া লইয়া সে তাহার কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল।

গিরণ তাহার পরিচয় পাইয়া সসম্ভ্রমে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে বলিল,— 'পাচক বালকের মুখে আপনার কথা শুনিয়া আমি আপনার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছি। নিকটেই আমার আলয়; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রে আমার আতিথ্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।'

গিরণ বলিলেন,—'আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ; কিন্তু ক্ষমা করিবেন, আজ আমি আপনার আতিথ্য

গ্রহণ করিতে অক্ষম। আমি কোন বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য বহির্গত হইয়াছি ; যতক্ষণ না তাহা সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ কোথাও আতিথ্য স্বীকার নিষিদ্ধ। আপনার এই সহৃদয়তা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।'

শিবালিক এই কথা শুনিয়া কয়েক মূহুর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—'তা' হ'লে আর আপনাকে বেশী অনুরোধ করিতে পারি না। ভাল কথা, ছেলেটীর মুখে শুনিয়াছিলাম, আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আছেন। কই, তাঁকে ত দেখিতে পাইতেছি না!'

'এই পাশের ঘরে তিনি আছেন', এই বলিয়া গিরণ সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

স্বামী স্ত্রীতে পৃথক ঘরে থাকার কোন সন্তোষ জনক কারণ বুঝিতে না পারিয়া ধূর্ত্ত শিবালিক মনে মনে স্থির করিয়া লইল যে দুইজনের মধ্যে নিশ্চয়ই মনোমালিন্য হইয়াছে। দুষ্ট অভিসন্ধি সাধনের ঠিক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া সে গিরণকে বলিল—'বাল্যকালে আমি রাজা অনিলের বড় স্নেহ

ভাজন ছিলাম, অনিন্দ্যাও আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন, আপনাদের বিবাহের সময় আমি দুর্ভাগ্য ক্রমে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। আজ আপনাদের দুইজনকে এখানে পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি। একবার অনিন্দ্যাকে দেখিবার অনুমতি পাইতে পারিব কি ?'

'স্বচ্ছন্দে আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।' এই বলিয়া গিরণ একটু ভ্রুকুটী করি-লেন ; তাহা শিবালিকের চক্ষু এড়াইল না। সে হৃষ্টচিত্তে অনিন্দ্যার দর্শনে গমন করিল।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## শিবালিক কি চায় ?

মেঘম্লান জ্যোৎস্নার ন্যায় বিষাদভারাক্রান্তা অনিন্দ্যা ক্ষীণালোকিত কক্ষে বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। স্বামী যে তাঁহার প্রতি এরূপ রূঢ় ব্যবহার করিতেছেন সে জন্য যত না হউক, তাঁহার মস্তিষ্কের বিকার আশঙ্কা করিয়া তিনি দুঃখাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। তা'র উপর সমস্তদিন পথপর্য্যটনে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারিয়া অনাস্তৃত কক্ষতলে শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক সেই সময়ে শিবালিক ধীরপদে অনিন্দ্যার ঘরের দ্বার দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জন অপরিচিত পুরুষকে স্বীয় কক্ষে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া সাধ্বী রমণী তৎক্ষণাৎ অতি চকিতভাবে উঠিয়া

বসিলেন, এবং ভীত অথচ দৃঢ় স্বরে তাহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিবালিক তাহার নির্ণিমেষ দৃষ্টি অনিন্দ্যার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া অনভ্যস্ত কোমল ও মৃদু স্বরে বলিল—"অনিন্দ্যা, তোমার দাস শিবালিককে কি ভুলিয়া গিয়াছ? ভূলিয়া যাইবারই কথা; পাঁচ বৎসর হইয়া গেল। কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই। অনিন্দ্যা, সত্য সত্যই কি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ?"

দুষ্ট শিবালিককে সেই সময়ে সেখানে দেখিয়া অনিন্দ্যা যুগপৎ এরূপ ভীতা ও বিস্মিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে দুর্ব্বৃত্তের শেষ কথা গুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তিনি ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এখন এখানে কেন? কি চাও?"

দুরাত্মা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি কি চাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? চাই তোমাকে আমার রাণী করিতে। আমি জানি তোমার স্বামী তোমাকে ভাল বাসেন না। যদি তাঁহার প্রণয় লাভের প্রত্যাশা

করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি হতাশ হইবে। ভালবাসা না পাইলে রমণীর জীবনে সুখ কি? আর যদি সমুদ্রের ন্যায় গভীর ভালবাসা পাইতে চাও, ত আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। তোমার কৈশোর হইতে তোমাকে আমি ভাল বাসিয়াছি। আজ পাঁচ বৎসর কাল তোমার স্মৃতি বুকে ধারণ করিয়া কত কষ্টে কাল কাটাইয়াছি। আজ কি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না? বল, অনিন্দ্যা, বল, তুমি কি আমার হইবে না?"

মনঃকষ্টে ম্রিয়মাণা অনিন্দ্যা যখন দুরাত্মার এই ঘৃণিত প্রস্তাব শুনিলেন, তখন তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল। ক্রোধে ও ঘৃণায় যুগপৎ তাঁহার কোমল হৃদয় অভিভূত হইল। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন।

পাপিষ্ঠ শিবালিক অনিন্দ্যার মৌনভাব তাঁহার সম্মতিজ্ঞাপক স্থির করিয়া মনে মনে ভাবিল এখন আর বেশী পীড়াপীড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কাল

অতি প্রত্যুষে আসিয়া গিরণকে অনায়াসে হত্যা করিয়া অনিন্দ্যাকে অতি সহজেই হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিব! এখন ইহারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রের মত বিশ্রাম করুক।" প্রকাশ্যে বলিল, 'এখন আমি তবে চলিলাম। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। সুখই যদি তোমার জীবনের লক্ষ্য হয়, তা হ'লে আমার প্রস্তাব উপেক্ষা করিবে না। কাল প্রত্যুষে আবার আসিব।'

এই বলিয়া শিবালিক ত্বরিতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## পলায়ন

পাপিষ্ঠ যে কখন চলিয়া গেল, অনিন্দ্যা তাহা জানিতেও পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে সে আর সেখানে নাই, তখন একটু প্রকৃতিস্থা হইলেন; এবং দুরাত্মার অভিপ্রায় ও নিজের অবস্থা বুঝিয়া ভীত হইলেন বটে, কিন্তু কিরূপে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। স্বামী বোধ হয় এতক্ষণ নিদ্রাগত হইয়াছেন; যদিও বা জাগিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি যেরূপ ক্লান্ত হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার এখন নিদ্রার একান্ত প্রয়োজন। এ সময় তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আর শিবালিক যখন এই মাত্র চলিয়া গেল, তখন রাত্রি ভোর হইবার পূর্ব্বে বোধ হয় সে আর আসিতেছে না। দু দণ্ড রাত্রি থাকিতে এখান থেকে প্রস্থান করিতেই হইবে। এই

রূপ ভাবিয়া অনিন্দ্যা তখন আর স্বামীকে কিছু না/ জানাইয়া কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন, এবং পুন রায় অঞ্চল ভূমিতে বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনই মনে হইল যে ঘুমাইয়া পড়িলে হয়ত রাত্রি থাকিতে জাগরিত নাও হইতে পারেন। সুতরাং বসিয়া জাগিয়া থাকাই এই অবস্থায় যুক্তিসঙ্গত।

অনিন্দ্যা উঠিয়া বসিলেন, এবং বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা নিদ্রাজড়িত চক্ষুদ্বয় মার্জ্জিত করিলেন। এইরূপে বাধা পাইয়া নিদ্রা যেন আরও জোরে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। কিন্তু তিনি পণ করিয়া বসিয়াছেন যে ঘুমাইবেন না। সে অদম্য মানসিক বলের কাছে কি শারীরধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু এই রূপে পরাভূত হইয়াও নিদ্রা একেবারে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। প্রায়ই তাঁহার অজ্ঞাতসারে আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছিল। তখন আবার তাহাকে তাড়াইতে নূতন উদ্যমের প্রয়োজন হইতেছিল। এই রূপে প্রহরের পর প্রহর কাটিতে লাগিল। যখন বুঝিতে পারিলেন যে রাত্রি

অবসানের আর বেশী বিলম্ব নাই, তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং নিঃশব্দে দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আকাশে তখনও দু একটি তারকা ক্ষীণ আলোক বিকীরণ করিতেছিল। শুক্লা সপ্তমীর খণ্ড শশী তখনও নীল আকাশ গাত্রে রজতময়ী তরণীর ন্যায় ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছিল। তখনও বেশ অন্ধকার আছে। কিন্তু চারিদিকে সব নীরব,নিস্তব্ধ : শুধু ঝিল্লিরব সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল!

অনিন্দ্যা প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। সুপ্তা প্রকৃতির সেই নীরব গাম্ভীর্য্য ও অবসানপ্রায় রজনীর সেই ম্লান সৌন্দর্য্য তাঁহার বিষন্ন হৃদয়কে অধিকতর বিষাদিত করিল। চিন্তাভারে তাঁহার মন প্রপীড়িত হইতে লাগিল। বিবাহের পর এক বৎসর তাঁহার কত সুখেই কাটিয়াছে। পতিপ্রেমের আধিক্যই যেন তাঁহার পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতেছিল। এত সুখ যেন তাঁহার আত্মসাৎ করা উচিত হইতেছিল না। পরে পত্নীগতপ্রাণ স্বামী যখন তাঁহাকে

লইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বসিলেন, তখন যেন সেই অপরিসীম সুখও তাঁহার পাতিব্রত্যের অন্তরায় বলিয়া মনে হইতেছিল। তারপর আজ অকস্মাৎ একি ভাগ্যবিপর্য্যয়! অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! কি দোষে তিনি স্বামীর এরূপ বিরাগ-ভাজন হইলেন? তাঁহার সুখের রবি কি চিরতরে অস্তমিত হইল?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি গিরণের কক্ষের দ্বার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারমুক্ত ছিল; কক্ষমধ্যে গিরণ তখনও অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। দ্বারদেশে আসিয়া একবার তিনি দাঁড়াইলেন। গিরণের নিষ্ঠুর আদেশ তাঁহার মনে পড়িল। কিন্তু যখনই শিবালিকের শেষ কথা "কাল প্রত্যূষে আবার আসিব" তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তখনই তাঁহার আর সকল ভাবনা দূরী-ভূত হইল। কালবিলম্বে বিপদসম্ভাবনা জানিয়া তিনি তখনই স্বামীকে জাগাইতে অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময় গিরণের নিদ্রার গাঢ়তা

মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং অনিন্দ্যার দুই একবার মৃদু সম্বোধনেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার আদেশ অবহেলা করার জন্য তিনি পত্নীকে ভর্ৎসনা করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু অনিন্দ্যা কাতরভাবে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"জানি না ও চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য আমার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পত্নীর বিপদে পতিই একমাত্র সহায়। তাই আমি মহাবিপদে পড়িয়া এই অসময়ে প্রভুকে জাগাইয়াছি।" এই বলিয়া তিনি স্বামীর নিকট শিবালিক ঘটিত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

গিরণ বুঝিতে পারিলেন যে, এখনই দুরাত্মা দলবলসহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু তখনও তাঁহার মন স্ত্রীকে নির্দ্দোষ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। তাই তিনি

একটু ক্রুর বিদ্রূপের সহিত বলিলেন "কেন, শিবপ্র-লিককে তোমার পছন্দ হইল না ?" এই নিষ্ঠুর বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই অনিন্দ্যা বাত্যাহতা ব্রততীর ন্যায় মূচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। স্বামীর সমস্ত দুর্ব্ব্যবহার তিনি এতক্ষণ সহিয়া আসিতে-ছিলেন ; কিন্তু সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর যখন স্বামী কর্ত্তৃক এইরূপে অপমানিতা হইলেন, তখন তাঁহার যাতনা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিল।

অনিন্দ্যাকে মূচ্ছিতা হইতে দেখিয়া একবার গিরণের মনে হইল "তবে কি আমি অন্যায় সন্দেহ করিয়া পত্নীর প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছি ?" কিন্তু তিনি পূর্ব্বদিনের প্রত্যূষে স্বকর্ণে স্ত্রীর মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে পত্নীর অপরাধ সম্বন্ধে ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সে ধারণা সহজে যাইবার নয়। সে যাহাই হউক এখন তিনি অনিন্দ্যার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মূচ্ছাভঙ্গে তিনি যখন উঠিয়া বসিলেন, তখন

পূর্ব্বদিক ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব বিপজ্জনক জানিয়া গিরণ অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'এস, আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।' এই বলিয়া তিনি অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনিন্দা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীর অনুসরণ করিলেন। তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

## দস্যু হস্তে

প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশ লোহিত রাগে রঞ্জিত করিয়া তপনদেব ধীরে ধীরে দেখা দিতেছেন। সুপ্তা প্রকৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বদিকের পথ ধরিয়া গিরণ ও অনিন্দ্যা মৃদু-মন্দ বেগে অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়াছেন। শত্রুর অনু-সরণের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছেন মনে করিয়া অশ্বের গতি আরও মন্দীভূত করিয়া দিলেন। এখন আর অনিন্দ্যার প্রতি বাক্যালাপ বন্ধ করিবার সে কঠোর আদেশ নাই। কিন্তু শঙ্কাবিমূঢ়া অনিন্দ্যা এখন বিনা প্রয়োজনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন কথা কহিতে সাহস করিতেছিলেন না। দুইজনে এখন প্রায় পাশাপাশি যাইতেছিলেন। সূর্য্যোদয়ের অল্প ক্ষণ পরেই পশ্চাদভাগে দ্রুতধাবমান অশ্বের ক্ষুর শব্দ দম্পতী যুগলের কর্ণে প্রবেশ করিল। দু'জনেই অশ্বের মুখ ফিরাইলেন ; দেখিলেন যে, অন্যান দশ

জন অশ্বরোহী তীরবেগে তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। সকলেরই হাতে উন্নত বর্ষা ; সেই সুশাণিত অস্ত্রসমূহ সূর্য্য কিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহীকে শিবালিক বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

অনিন্দ্যাকে কিয়দ্দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া গিরণ দৃঢ় হস্তে বর্ষাটি লইয়া আক্রমণকারিগণের অভিমুখে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তিনি শত্রুগণের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। শিবালিক তাঁহার আক্রমণ এড়াইয়া পার্শ্বদিকে সরিয়া পড়িয়াছিল। ক্ষিপ্র প্রায় গিরণের ভীম বর্ষাঘাতে একজন অশ্বারোহী ভুতলশায়ী হইল। তখন একযোগে সকলে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল কিন্তু কি চমৎকার তাঁহার অস্ত্রশিক্ষা! একাকী তিনি দশজন যোদ্ধার অস্ত্রাঘাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আর গিরণের সৌভাগ্যক্রমে সম্মুখের তীব্র রবিকর তাহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছিল। সকলেই যখন বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহাকে

আঘাত করিতে উদ্যত তখন হঠাৎ অতর্কিত ভাবে গিরণ শিবালিককে এমন এক প্রচণ্ড আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই সে হতজ্ঞান হইয়া অশ্ব হইতে ভূপতিত হইল। দলপতির সাহসেই অনুচরগণের সাহস। তাহারা যখন শিবালিককে ভূতলশায়ী দেখিল, তখন যে কয়জন বাঁচিয়াছিল, তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

দূর হইতে দাঁড়াইয়া অনিন্দ্যা স্বামীর অদ্ভুত রণকৌশল দেখিতেছিলেন। অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু করিতেছিল। কাতরভাবে তিনি ভগবানের নিকট বিপন্মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন। পরে যখন শত্রুগণকে নিহত ও পলায়িত দেখিলেন, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তিনি ছুটিয়া স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন, এবং তিনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরণ কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই স্বামীর অঙ্গের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। নানাস্থানে গভীর

আঘাতচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং সেই সকল ক্ষত স্থান হইতে এরূপভাবে অজস্র রক্তস্রাব হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সত্যই গিরণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন; এবং অতিকষ্টে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিনি মূচ্ছিত হইয়া অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

এই নূতন বিপদে অনিন্দ্যা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নিজের পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করিয়া স্বামীর ক্ষত স্থান সমূহ বাঁধিয়া দিলেন, এবং নিকটে পতিত একখানি বৃক্ষ পত্র লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মূচ্ছাভঙ্গ হইল না। নিকটে কোথাও জল পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মূচ্ছিত পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া পতিব্রতা সাধ্বী সেই পথিপার্শ্বে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দণ্ডখানেক কাল অতিবাহিত হইলে, এক দল দস্যু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গ্রামান্তরে দস্যুতা করিতে যাইতেছিল।

পথের পাশে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া দস্যুদলপতি সেখানে দাঁড়াইল এবং অনিন্দ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল- "সুন্দরী, মৃত ব্যক্তির জন্য কেন মিছামিছি কাঁদিতেছ ? উহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠ ; নিকটেই আমার আলয়, সেখানে গেলে তোমার আর কোন কষ্ট থাকিবে না।"

অনিন্দ্যা কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দলপতি তখন একটা ইঙ্গিত করিতেই একজন দস্যু অগ্রসর হইয়া গিরণকে অনিন্দ্যার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টিত হইল। অভাগিনীর তখনকার মানসিক অবস্থা কল্পনারও অতীত। পাছে তাহাদের বল প্রকাশে আহত ও মূর্চ্ছিত স্বামীর অনিষ্ট হয়, তাই তাহাদের নির্ম্মম চেষ্টার বাধাও দিতে পারিতেছেন না, আবার কোন প্রাণেই বা তিনি সেই কালান্তক সদৃশ দস্যুদের হাতে স্বামীকে ছাড়িয়া দিবেন ? কিন্তু এই ভীষণ বিপদেও তিনি ধৈর্য্য হারাইলেন না। তিনি আর কোন

উপায় না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দলপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমার স্বামী জীবিত আছেন। আমার সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া চল।" তিনি ভাবিয়াছিলেন যে পথের ধারে এরূপভাবে পড়িয়া থাকিলে স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত। দস্যুর আলয়ে গেলে হয়ত বাঁচিতে পারেন। তারপর পরমেশ্বরের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। সতীত্বের তেজে তাঁহার হৃদয়ে এখন সাহস আসিয়াছে।

দস্যু দলপতি কি ভাবিল জানিনা। সে এক জন অনুচরকে গিরণকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিল। দুইজন দস্যু তাঁহাদের দুইজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অপর সকলে তাহাদের অভীষ্ট কার্য্যে গমন করিল।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## মুক্তি।

অনতিবিলম্বে দস্যুদ্বয় তাঁহাদের দুইজনকে অরণ্যমধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। গৃহ মধ্যে এক বৃহৎ প্রাঙ্গন; সেইখানে অনিন্দ্যাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে হইল। অতঃপর সেই প্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে একটি দালানে লইয়া গেল। তাহারই এক পার্শ্বে অনিন্দ্যাকে তাহাদের প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিয়া এবং মৃতবৎ মূর্চ্ছিত গিরণকে তাঁহার নিকট নামাইয়া দিয়া তাহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার আগে তাহারা একজন ভৃত্যকে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতে আদেশ দিয়া গেল।

পুরীটি জন শূন্য বলিয়া বোধ হইল। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনিন্দ্যা জানিলেন যে বাড়ীর স্ত্রী

লোকগণ তখনও নিদ্রিত। সেই দস্যুপুরীতে কিরূপ প্রকৃতির স্ত্রীলোক থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন ।

কিন্তু তিনি এখন বিপদে একেবারে অভিভূত না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে শিখিয়াছেন। স্বামী তখনও মূর্চ্ছিত ; সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার এখন তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

তাঁহার আদেশ ক্রমে ভৃত্য তাঁহাকে শীতল জল ও ব্যজনী দিয়া গেল। তিনি সাধ্যমত প্রকারে পতির মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হইয়া একাগ্রমনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন !

সতীর কাতর আহ্বানে কি ভগবানের আসন না টলিয়া থাকিতে পারে ? কিয়ৎক্ষণ পরেই গিরণ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। একবার তিনি বিস্ময়পূর্ণ চক্ষে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, এবং পরক্ষণেই ক্ষীণকণ্ঠে 'জল' এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া

আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তখন তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত।

অনিন্দ্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ শীতল বারি পান করাইলেন। তারপর ভৃত্যের সাহায্যে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া অত্যল্প মাত্রায় তাঁহার গলাধঃকরণ করাইলেন।

গিরণ পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অনিন্দ্যা মনে করিলেন অত্যধিক দুর্ব্বলতাই বোধ হয় তাহার কারণ।

সেই জনশূন্যবৎ প্রকাণ্ড পুরীতে অনিন্দ্যা পতির পার্শ্বে একাকিনী বসিয়া রহিলেন। প্রহরের পর প্রহর যাইতে লাগিল; প্রভাত রবির মৃদু কিরণ ক্রমে মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে পরিণত হইল। আবার তাহা মন্দীভূত হইয়া দিনদেবের বিহার কালের সূচনা করিল।

পতিপ্রাণা অনিন্দ্যা তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর ন্যায়ই নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট। পূর্ব্বদিনের পথ পর্য্যটন, অনাহার ও অনিদ্রা তাঁহার শরীরে যে অবসাদ আনিয়া

দিতেছিল, তাহা তাঁহার মানসিক বলের কাছে তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। তার পর আজও সমস্ত দিন তিনি উপবাসী। তিনি কেবল বিপদভঞ্জন ভগবানের নিকট এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন; আর মাঝে মাঝে কাতর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে ছিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; নানা দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। এখনই হয়ত দস্যুরা আসিয়া পড়িবে। গিরণ এখনও উঠিতেছেন না কেন? এখনও হয়ত এই নরক সদৃশ স্থান হইতে পলায়ন করিতে পারা যাইত! তবে কি এই নারকীগণের সহিত এই খানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে? না জানি এখনও কত কষ্ট ও লাঞ্ছনা কপালে আছে।

অনিন্দ্যা জানিতেন না যে গিরণ যে দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন তাহাতে একপ্রকার মাদকদ্রব্য মিশ্রিত ছিল। দস্যুরা সমস্ত পানীয়ের সহিত তাহা মিশাইয়া পান করিত। তাহা কিয়ৎ পরিমাণে মদ্যের কাজ

করিত। কিন্তু যাহারা তাহা পানে অনভ্যস্ত তাহারা গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িত। গিরণের শারীরিক দুর্ব্বলতা এই মাদকদ্রব্য জনিত নিদ্রাকে বহুক্ষণ স্থায়ী করিয়াছিল।

অনিন্দ্যা যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই হইল। একটা বিকট চীৎকার দস্যুগণের আগমন ঘোষণা করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। লুন্ঠিত দ্রব্য সমূহ তথায় স্তুপিকৃত করিয়া তাহারা মহা কোলাহল করিতে করিতে সেই দালানে আসিয়া কেহ উপবেশন করিল, কেহ দিবসের কার্য্য জনিত উত্তেজনায় পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সেখানে প্রচুর পরিমাণে মদ্য মাংস প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা সকলেই আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের কলরবে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল।

অনিন্দ্যা অত্যন্ত ভীত হইয়া একপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। দস্যুদের চীৎকারে গিরণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই মাদকদ্রব্যের গুণে

তিনি চক্ষু খুলিতে পারিতেছিলেন না। সন্ধ্যার আবছায়ে দস্যুরা প্রথমে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। বোধ হয়, তাঁহাদের বিষয় তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু আহারের সময় দালানটিতে যখন উজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত হইল, তখন দস্যুপতির দৃষ্টি অনিন্দ্যার প্রতি পতিত হইল। তখনই সে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "সুন্দরি, তুমি সমস্ত দিন কিছু খাও নাই? এখনও এই মরা লোকটিকে লইয়া বসিয়া আছ? এস, আমাদের সঙ্গে আহার করিবে এস।"

অনিন্দ্যা সাহসে ভর করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমার স্বামী নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন, ততক্ষণ আমি কিছুই খাইব না।"

দস্যুপতি ইহা শুনিয়া বিদ্রূপ-বিকৃতস্বরে বলিল "কি! এই দশ বার ঘণ্টা ধরিয়া লোকটা ঘুমাইতেছে! তুমি পাগল হইয়াছ! গায়ে যে রকম

আঘাত দেখিয়াছি, তা'তে মানুষ কি কখনও বাঁচিতে পারে ? আর মিছে কেন ভাবিয়া মর ? এস, শীঘ্র এস। তুমি না আসিলে আমার আজ খাইয়া সুখ হইবে না।" এই বলিয়া সে অনিন্দ্যার অভিমুখে দুই এক পদ অগ্রসর হইল।

অনিন্দ্যা নিজের বিপদ বুঝিতে পারিলেন। বিপদে একমাত্র সহায় স্বামীর দিকে একবার চাহিলেন। এত গোলমাল কোলাহলেও তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না কেন ? তবে কি সত্য সত্যই তিনি মহানিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন ? না, তাহা হইবে কেন ? গাত্র ত হিমশীতল হইয়া যায় নাই ?

দস্যুপতিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি কাতর কণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, "আমার স্বামী যতক্ষণ না আমাকে আহার করিতে বলিবেন, ততক্ষণ আমি জলস্পর্শ করিব না।"

"আমার কাছে ওসব ওজর খাটিবে না," এই বলিয়া সে বলপূর্ব্বক অনিন্দ্যাকে লইয়া যাইতে অগ্রসর হইল। ভয়বিহ্বল অনিন্দ্যা উদ্ধারের আর

কোন উপায় নাই দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গিরণ শুইয়া শুইয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। পরে যখন তিনি পত্নীর ক্রন্দন শুনিলেন, তখন এক প্রবল চেষ্টায় দৌর্ব্বল্য ও জড়তাকে দূর করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন ; এবং নিমেষের মধ্যে কোষ হইতে তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দস্যুপতির মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ অন্যান্য দস্যুগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।

যাহাকে তাহারা মৃত বলিয়া মনে করিয়াছিল, সেই মৃত ব্যক্তি দলপতিকে হত্যা করিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে দেখিয়া তাহারা মৃত শরীরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে স্থির করিল ; এবং ভয়ে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় যে যেখানে পারিল পলাইল। অনেকেই তাঁহার অস্ত্রাঘাতে ভূমিশয্যায় শয়ন করিল।

---

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## সতীর আনন্দ

পুরী শত্রুশূন্য হইয়াছে দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে পত্নীর কাছে আসিলেন, এবং সস্নেহে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্ত দ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিলেন, 'প্রিয়ে, তোমার এই নরাধম স্বামীকে কি তুমি ক্ষমা করিবে ? হায় ! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, তোমার ন্যায় দেবীস্বরূপিণী পত্নীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলাম ! জানি না কি জন্য তোমায় দিন দিন মলিন ও বিষণ্ণ দেখিতাম ; জানিনা কেন কাল ভোরে তোমার মুখে সন্দেহ পূর্ণ কথা শুনিয়াছিলাম। সে সকলের কারণ এখন আর তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না। কারণ তুমি যে কতদূর পতিপ্রাণা তাহা আজ বুঝিতে পারিয়াছি। অনিন্দ্যা তুমি কি আমায় ক্ষমা করিবে ?"

অনিন্দ্যা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গদ গদ

কণ্ঠে কহিলেন, "নাথ, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভগবানের নিকট আমাকে অপরাধী করিতেছেন ? আমার ন্যায় তুচ্ছ রমণী যে আপনার প্রণয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে ? আমার সুখের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু শত্রুগণ যে আপনাকে স্ত্রৈণ বলিয়া নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই জন্যই আমি মনে মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। আমি মুখ ফুটিয়া একথা আপনাকে বলিতে পারিতাম না। কাল ভোর বেলা আমি মনে মনে এই কথা তোলাপাড়া করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, আমি তবে বুঝি আপনার প্রকৃত পত্নী হইতে পারিলাম না। তা'র পরেই আমাকে লইয়া আপনি বাহির হইয়া পড়িলেন। আপনার এই দুইদিনের কার্য্যাবলী আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু এখন আমার কি আনন্দ !

গিরণ আবেগভরে পত্নীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ওঃ, আমি কি ভ্রমেই পতিত হইয়া-

ছিলাম! হায়,অদৃষ্টের কি ঘোর পরিহাস! ভগবানের কি নিদারুন পরীক্ষা,যে যত দুঃখকষ্ট তোমাদের ন্যায় আদর্শ রমণীদের কপালেই থাকে! সীতা, সাবিত্রী, শৈব্যা, দময়ন্তী প্রভৃতি পূত চরিতা আৰ্য্যনারীগণের করুণ দুঃখ কাহিনী কা'র না হৃদয় পীড়িত করে? আজ তুমি তাঁহাদেরই ন্যায় মহিমাময়ী; অগ্নিপূত স্বর্ণখণ্ডের ন্যায় পবিত্রতায় উজ্জ্বল। আর আজ তুমি আমায় যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহার জন্য চিরকাল তোমায় গুরুর আসনে বসাইয়া রাখিব। আর তুমি কখনও আমায় কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে দেখিবে না। আজ তোমার কাছে শিখিলাম যে, যে প্রেম জীবনের কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম ভুলাইয়া দেয়, তাহা প্রেম নয়, তাহা মোহ মাত্র। এতদিন আমি সেই মোহে মত্ত ছিলাম, মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছিলাম। তুমি প্রকৃত পত্নীর কাজ করিয়াছ, আমায় নষ্টপ্রায় কৰ্ত্তব্যজ্ঞান জাগাইয়া দিয়াছ। কিন্তু হায়, তৈল যেমন নিজে পুড়িয়া অন্ধকার কক্ষ আলোকিত করে, তুমি ও তেমনই নিজে দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া

আমার মনের অন্ধকার দূর করিয়াছ। আজ আমি তোমার প্রতি পৈশাচিক দুর্ব্ব্যবহারের জন্য যেমন ভীষণ অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, তেমনই আবার এতদিনে তোমার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি।”

মানসিক উত্তেজনা গিরণের শারীরিক দুর্ব্বলতাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য দূর করিয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল; তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। লজ্জানতমুখী অনিন্দ্যার গাত্রে ঢলিয়া পড়িয়া তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন; এবং হর্ষাবেগভরে বারংবার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কিয়ৎকাল তাঁহার স্কন্ধদেশে স্বীয় মস্তক ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন।

তা'র পর ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া তিনি অনিন্দ্যাকে বলিলেন, ‘প্রিয়ে, এই রাত্রিটা এই খানেই কোন রকমে কাটাইয়া দেওয়া যাক্। এখন বোধ হয় এখানে আর বিপদের আশঙ্কা করিবার

কোন কারণ নাই। ভোরেই আমরা এখান থেকে প্রস্থান করিব।" এই বলিয়া তিনি সেইখানেই শুইয়া পড়িলেন, আর পত্নীকেও নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি শয়ন না করিয়া নিদ্রিত পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

আজ অনিন্দ্যার কি আনন্দ! সেই আনন্দের প্রবল বন্যায় গত দুই দিনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভাসিয়া গেল। সুখময় বর্ত্তমানের কাছে, সে সকল দুঃখময় ব্যাপার এখন তাঁহার নিকট অলীক স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। আনন্দের প্রাবল্যে তাঁহার আর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। পূর্ব্ব রাত্রের অনিদ্রা সত্ত্বেও তিনি এখনও জাগিয়া থাকিতে কষ্ট অনুভব করিলেন না।

---

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

## কে এ ?  অদীরণ !

নিদ্রাভঙ্গে গিরণ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া পত্নী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন, তখন তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"অনিন্দ্যা, তুমি দেবী না মানবী? মানবে কি এতগুণ, এত কষ্টসহনশীলতা সম্ভবে? হায়, কি মোহেই আমি আচ্ছন্ন ছিলাম! আর তোমার উপর আমি যে অত্যাচার করিয়াছি, তত অত্যাচার বুঝি অদীরণও করে নাই। আমার এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই।"

অনিন্দ্যা যেন লজ্জাজড়িত স্বরে কিছু বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু ঠিক সেই সময়ে বাহিরে শব্দ হইল। পরক্ষণেই উন্মুক্ত বর্শাহস্তে কয়েক-জন অশ্বারোহী অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিরণের দিকে ধাবিত হইল।

এ কি! যেই তাঁহার নিকটে আসা, অমনি অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি অস্ত্র নামাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল কেন? সে বিস্ময় কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"অনিন্দ্যা!—গিরণ! আপনারা এখানে! ব্যাপার কি?"

এ ব্যক্তি আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত অদীরণ। তাহাকে সদলবলে তখন সেইখানে দেখিয়া তাঁহারা দুই জনেই স্থির করিলেন যে, তাহার পূর্ব্বচরিত্র সংশোধিত হয় নাই; সে নিশ্চয়ই এখানে দস্যুবৃত্তি করিতেছে। অনিন্দ্যার চোখে মুখে আশঙ্কার ভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িল, গিরণ ও সাধ্যমত আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র লইতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া অদীরণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"কুমার, আপনি অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। আমি আর আপনাদের শত্রু নই। অনিন্দ্যা তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ? শুন; আমি আর সে অদীরণ নাই; এখন আমি একজন মানুষ, এখন আমি রাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের

অনুচর, দস্যু-তস্কর প্রভৃতি অত্যাচারীর দমনকারী অদীরণ। তোমারই কৃপায় আমার এই অসম্ভাবিত পরিবর্ত্তন। তুমিই আমার প্রাণ দিয়াছিলে ; আর কুমার, আপনি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি, অত্যাচারীর দমনে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি। দস্যুদমন করার জন্য আমার এ সময়ে এ স্থলে আগমন। এই প্রদেশে দস্যুর অত্যাচারে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে দুর্বৃত্তেরা দিবাভাগেই ডাকাতি করে। দলে দলে লোক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল,আর কাতর-ভাবে নিজেদের দুরবস্থার কথা মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছিল। প্রজাবৎসল মহারাজ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দস্যুদল সমূলে ধ্বংস করিতে সৈন্য সামন্ত লইয়া নিজেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছি। নানাস্থানে দস্যুদের বিনাশ করিয়া অবশেষে কাল রাত্রে আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

শুনিলাম এখানকার দস্যুরাই নাকি দিনের বেলা লুণ্ঠন করিতে বহির্গত হয়। তাই আমি ভোর হইতেই মহারাজের আদেশে এই পুরী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলাম। চারিদিকেই সৈন্য সন্নিবেশিত আছে; কাহারও পলাইবার উপায় নাই। কিন্তু, কই, একজনও দস্যু দেখিতেছি না ত? তাহারা কি বাহির হইয়া গিয়াছে? আর আপনারাই বা এখানে কেন?"

দুইজনে এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া অদীরণের এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে গিরণ কহিলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ, যে তোমার এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে এখানে আর তোমার কিছু করিবার নাই। ঐ দেখ দস্যুদের ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি যাইতেছে। কেহ কেহ পলায়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কেহ আর এদিকে দস্যুতা করিতে সাহস করিবে না। ঐ তাহাদের দলপতির মস্তকহীন শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। আমি যে কি রূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিব। এখন এখানে নিজের বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। একে, আমি নিজে অত্যন্ত দুর্ব্বল, তা'তে আবার গত দুইদিনে আমাদের ভাল আহার জুটে নাই ; এ সময় এরূপ আশ্রয় না পাইলে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িত। এখন চল আমরা মহারাজের নিকট গমন করি।" এই বলিয়া তিনি অনিন্দ্যাকে পার্শ্বে লইয়া অগ্রসর হইলেন ; অদীরণ ও অনুচরগণসহ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

---

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## রমণী রত্ন

স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য হৃদয়ে যে অনুতাপ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা উৎপাটিত করিবার মানসে গিরণ মহারাজ ধর্ম্মপালের নিকট সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। মহারাজা তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া কয়েক মূহূর্ত্ত গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—'এই সংসারে এমন মানুষ বোধ হয় কেহ নাই যাহাকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, যাহার নিকট কোন-না-কোন সময়ে পৃথিবীটা মরু ভূমি তুল্য বোধ না হয়! কিন্তু এই মরু ভূমিকে সুখের নন্দনে পরিণত করিতে, এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে ও আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিতে, একটি জিনিস আছে; তাহা পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়। যে দম্পতী

পরস্পরকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছে, তাহাদের নিকট সংসারের কোন কষ্ট, কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। এখানেই তাহারা স্বর্গসুখ ভোগ করে, প্রেমামৃত পানে তাহারা বিভোর হইয়া থাকে। জীবন তাহাদের চির সুখময়। কিন্তু যখনই দম্পতী যুগলের মধ্যে একজন অপরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের সমস্ত সুখ চির বিদায় গ্রহণ করে, অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল পান করিয়া তাহারা তখন অনন্ত যাতনায় জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এই সন্দেহ যে অধিকাংশ স্থলেই অন্যায় ও ভিত্তিহীন, তাহা কালক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন হয়ত যাহা অনিষ্ট হইবার হইয়া গিয়াছে। তখন সেই হতভাগ্য সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির অবস্থাটা যে কি রকম হয় তাহা ভাবিলেও মনে কষ্ট হয়! এই রকম সন্দেহের কারণ কি? কারণ এই যে, মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থপর, ভাল-বাসাতেও তাহার স্বার্থপরতা অনেক সময়ে পূর্ণ মাত্রায় থাকে। সে ষোল আনা পাইতে চায়,

একটু ত্রুটি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নয়। এই ভাবটা অপরের পক্ষে বড় কষ্টকর হয়। ফলে একজন নানা অন্যায় সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিতে আরম্ভ করে ; আর অন্য জন হয় সরল ভাবে পূর্ব্ব-বৎ আচরণ করিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হইতে থাকে, নয় অভিমানভরে হঠকারিতায় প্রবৃত্ত হয়। তোমাদের মধ্যেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। কিন্তু তোমার সৌভাগ্য যে তুমি অনিন্দ্যার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা পাইয়াছ, যিনি এত অনাদর সত্ত্বেও তোমার প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই। তাহা না হইলে হয়ত এখন তোমার কেবল অশ্রু ও হাহাকার মাত্র জীবনের সম্বল হইত। তুমি এরূপ পতিপ্রাণা পত্নী লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। আর তোমায় অধিক কি বলিব ? এখন বোধ হয় তোমার ন্যায় সুখী জগতে অতি অল্পই আছে। আশা করি ভবিষ্যতে এসুখে আর কোন বিঘ্ন, কোন ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইবে না।” তারপর নতমুখী অনিন্দ্যার দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, “মা,

আশীর্ব্বাদ করি যেন স্বামী-সোহাগিণী হইয়া চির-সুখে কালযাপন কর; আর পাতিব্রত্যের যে দৃষ্টান্ত আজ জগৎ সমক্ষে প্রচার করিলে, প্রার্থনা করি তাহা যেন লক্ষ লক্ষ রমণীকে নারীধর্ম্মে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করে।" কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'যাও, তোমরা বিশ্রাম ও আহারাদি করগে।"

সেই বন মধ্যে পটমণ্ডপে তাঁহারা দুই দিন অবস্থান করিলেন। গিরণ শরীরে বেশ বল পাই-লেন, আর তাঁহার ক্ষতসমূহও অনেকটা শুষ্ক হইয়া আসিল। তখন কুমার মহারাজের নিকট বিদায় চাহিলে, তিনি বলিলেন, "তাও কি হয়? তোমার শরীর এখন ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। আবার এই বনের মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা কি কখনও হইতে পারে? আমাদের এখানকার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। যাহা বাকী আছে, তার জন্য একদল মাত্র সৈন্য অদীরণের অধীনে এখানে রাখিয়া আমরা কালই রাজধানী অভিমুখে রওনা হইব। তোমরাও আমার

সঙ্গে সেখানে যাইবে। তারপর সেখান থেকে ধীরে সুস্থে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। তোমার পিতা ও আত্মীয় স্বজন যাহাতে চিন্তিত না হন, সেজন্য আমি তাঁ'দের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছি।"

গিরণ আর কোন আপত্তি করিলেন না; মহা-রাজার সঙ্গে তাঁহারা রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে গমন করিলেন। সেখানেও কয়েক দিন থাকিয়া উপযুক্ত যানাদি আরোহণে তাঁহারা গৃহাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন। মহারাজা তাঁহাদের সঙ্গে অনেক অনুচর দিলেন।

গিরণ কোন কিছু গোপন না করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের নিকট এই কাহিনী বিবৃত করিলেন। এইরূপে তিনি আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন।

শত মুখে তখন অনিন্দ্যার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। গিরণ আবার কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনো-নিবেশ করিলেন। তাঁহার ন্যায় আর এখন সুখী জগতে কে?

সম্পূর্ণ

## ভ্রমসংশোধন ।

২৬ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনে "অনুরাগ পরশে"র স্থলে "অনু-রাগ পাশে" এবং ৭৯ পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনে "বিহার" স্থলে "বিদায়" হইবে ।

# "পুরাতন প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে মতামত।

পুরাতন প্রসঙ্গ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত এম, এ, প্রণীত। মূল্য পাঁচসিকা। অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন জিনিষ আনিয়াছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক বিজ্ঞ, বহুদর্শী, পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হন না, অথচ তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনকালে এমন সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহারা এমন সকল বিবরণ জানেন, যাহা সাধারণের গোচর হইলে সত্যসত্যই ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রেণীর পণ্ডিত। তিনি যে সময়ে বিদ্যালয়ে ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে সময়ে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে অনেক রত্নের, অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সময়ের ঘটনাবলী নানা কাহিনী জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন উপলক্ষে বিপিন বাবু যে সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই যথোপযুক্তরূপে সাজাইয়া তিনি এই প্রসঙ্গ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এমন সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অনেকেই জানেন না; আর বিপিন বাবু যে প্রকারসুন্দরভাবে মনোহর ভাষায় কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে উপন্যাস ফেলিয়া পাঠকের এই পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হইবে। এই পুস্তকের ছাপা, কাগজ,

## ভ্রমসংশোধন।

২৬ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনে "অনুরাগ পরশে"র স্থলে "অনু-রাগ পাশে" এবং ৭৯ পৃষ্ঠায় ১৪ লাইনে "বিহার" স্থলে "বিদায়" হইবে।

# "পুরাতন প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে মতামত।

পুরাতন প্রসঙ্গ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত এম, এ, প্রণীত। মূল্য পাঁচসিকা। অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন জিনিষ আনিয়াছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক বিজ্ঞ, বহুদর্শী, পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে সম্মত হন না, অথচ তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবনকালে এমন সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহারা এমন সকল বিবরণ জানেন, যাহা সাধারণের গোচর হইলে সত্যসত্যই ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে। অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রেণীর পণ্ডিত। তিনি যে সময়ে বিদ্যালয়ে ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যে সময়ে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সে সময়ে বঙ্গদেশে অনেক রত্নের, অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই সময়ের ঘটনাবলী নানা কাহিনী জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন উপলক্ষে বিপিন বাবু যে সমস্ত কথা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই যথোপযুক্তরূপে সাজাইয়া তিনি এই প্রসঙ্গ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এমন সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অনেকেই জানেন না; আর বিপিন বাবু যে প্রকারসুন্দরভাবে মনোহর ভাষায় কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে উপন্যাস ফেলিয়া পাঠকের এই পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হইবে। এই পুস্তকের ছাপা, কাগজ,

বাধাই সমস্তই উৎকৃষ্ট ; তাহার পর আবার ইহাতে চারি-খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে ! বাঙ্গালী পাঠকদিগকে আমরা এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

"ভারতবর্ষ" ভাদ্র ১৩২০

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সম-সাময়িক শিক্ষিত সমাজের অলঙ্কার ছিলেন। সে সময়ের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার সহচর-সহকর্ম্মী, সুহৃদ, তিনি যে প্রতিভার অধিকারী, সে প্রতিভা নানারূপে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিত। কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনের পর বিলাতী সভ্যতার প্রথম আবির্ভাবের ফলে দেশের মনীষিদিগের নিকট যে সকল নৈতিক, সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধান সন্ধান করিয়াছিল, সে সকলের কথা—সে সময়ের ইতিহাস লিখিতে তাঁহার মত যোগ্যতা আর কাহারও নাই। তিনি সেই সকল সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি যে স্মৃতিকথা বিবৃত করিয়াছেন—দ্বারকানাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, তারকনাথ পালিত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বর্গ প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব কথায় নব্য বঙ্গের ইতিহাসেই এক অধ্যায় বুঝিবার উপায় হইয়াছে—বাঙ্গালী সমাজের গতি ও প্রকৃতি, আবর্ত্তন বিবর্ত্তন বুঝিবার পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এমন পুস্তক বাঙ্গলায় দুর্লভ। বঙ্গদেশে যে এই পুস্তকের সমাদর হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

'বসুমতী' ৪ঠা আশ্বিন—১৩২০

বিপিনবাবু এই পুরাতন প্রসঙ্গে সাধারণের সম্মুখে অধুনা নীরব-ঋষিকল্প আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখ হইতে যে পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীকে অভিনব সম্পদ দান করিবে। এই প্রসঙ্গ হইতে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত, বিদ্যোৎসাহী ধনিগণের বেশ একটী আনন্দোদ্দীপক ও সরস বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। ইহার ভিতর এমন অনেক কথা আছে যাহা তিনি না বলিলে, বঙ্গবাসীর কোন দিন জানিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিলনা। কেবল ইহাই নয়, গ্রন্থকার প্রসঙ্গ ক্রমে বিদেশের লেখকদের কথাও অনেক বলিয়াছেন; জটিল প্রশ্নের মীমাংসাও গ্রন্থের অনেক স্থলে আছে।

বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিপিনবাবু এই যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলা সাহিত্যে নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক, কোথাও একঘেয়ে বলিয়া বোধহয় না, প্রতি অধ্যায়ে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল, কোথাও আড়ম্বর নাই, বলিবার ভঙ্গীখুব নূতন। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল। আশাকরি গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

'মানসী' ভাদ্র ১৩২০'

Professor Bepin Bihari Gupta's "**Puratan Prasanga**" is a remarkable contribution to Bengali literature. It is a survey of the social and educational movements in Bengal during the latter half of the nineteenth century. The author's method of treatment is new; his style attractive.

The various chapters are a series of reminiscences of Pundit Krishna Kamal Bhattacharya, the aged scholar, who adorned the chair of the Principal of the Ripon College for several years. A close associate of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar, Madan Mohan Tarkalankar, Taranath Tarkavachaspati, Dwarka Nath Vidyabhusan and a host of men who were unostentatiously making history, Pundit Krishna Kamal has been able to throw a flood of light upon some unwritten chapters of the history of Bengal. Iswar Gupta was the last great literary exponent of an age which was no more; with Iswar Chandra Vidyasagar began a new era,—an era of reconstruction on the broad basis of English culture. The Sanskrit College was remodelled, it was wrenched away from its traditional moorings; students from any Hindu caste were to be admitted into it; the method of teaching sanskrit grammar was revolutionised; English literature was to be regularly taught. And the great Pundit began to translate Marshman's History and Chamber's Biography into Bengali; around him gathered Ram Kamal Bhattacharya, Hari Nath Sarma, Tara Sankar, Krishna Mohan Banerjee, Dwaraka Nath Vidyabhusan, Shyama Charan Sarkar, Akshay Kumar Dutta and scores of othero, who assisted the renaissance of Bengali literature. We have also in this book glimpses of the new epoch, ushered in by Bankim Chandra. Besides we have an account of the silent revolution in manner and taste, of the great controversy on the remarriage of the widows, of the satirical literature developed by Kali Prosanna Singha and Tek Chand Thakur, and of the astonishing development of dramatic literature under the patronage of the aristocrats of Calcutta. There are so many personal touches that it is very difficult to pick and choose. For example, of the great donor of 15 lacs to the Calcutta University, Pundit Krishna Kamal says that his instinct of charity is hereditary, that Dr. Durga Charan Banerjee once said to Sir Tarak Nath's father, "you are the architect of many a man's fortune in town." The book closes with a delightful after piece in the shape of a farcical play from the pen of the great poet Hem Chandra Banerjee. We congratulate Prof. Gupta and the publishers Messrs Gurudas Chatterjee & Sons.

*"Bengalee", 31st August, 1913.*